সংবাদ

তারিখ ... 15 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

এসএসসি পরীক্ষা এবং অস্বাভাবিক ড্রপ-আউট

দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষা। একই দিনে সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ বছর থেকে নবগঠিত দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

আজ এসএসসির ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি এরই মধ্যে শিক্ষাবোর্ডগুলো সম্পন্ন করেছে বলে জানানো হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে আগামী ২৫ মে। আমরা পরীক্ষায় সব শিক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করছি। পরীক্ষার্থীদের জন্য এটাই প্রথম পাবলিক পরীক্ষা।

প্রতি বছরের মতো এবারও এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অস্বাভাবিক হারে 'ড্রপ-আউট' আলোচিত হচ্ছে। এবার ড্রপ-আউটের হার শতকরা ৪২ ভাগ। 'কম্বাইন্ড এডুকেশন বোর্ড কম্পিউটার সেন্টার' প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট ১২.৬৭ লাখ হাইস্কুল ছাত্রছাত্রী ২০০৭ সালে নবম শ্রেণীতে থাকার সময় নিয়মিত ছাত্রছাত্রী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর মধ্যে ৫.৩৪ লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেনি বা করতে পারেনি। এবার ৭.৩৩ লাখ নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩.৩ লাখ। নিবন্ধিত হয়েও ৫.৩৪ লাখ ছাত্রছাত্রী যে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না, তার কারণ প্রতি বছরের মতো এবারও আলোচিত হচ্ছে। তবে কোনটিই নতুন নয়।

এ ধরনের অস্বাভাবিক ঝরেপড়া আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার বড় একটা দুর্বলতা। এর সঙ্গে যদি সামাজিক ও আর্থিক কারণগুলো বিবেচিত হয় তবে আমাদের সার্বিক দুর্বলতাগুলো ধরা পড়বে। নিবন্ধনের পর পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অথবা পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারা বড় একটা কারণ। অন্যদিকে পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা (টেস্ট পরীক্ষা) পাস করতে না পারাও একটা কারণ। অনেক স্কুল তাদের পরীক্ষার ফল যেন ভাল দেখায় সেজন্য টেস্ট পরীক্ষা অত্যন্ত কড়াকড়ি করে। এর মধ্যে নামিদামি বিদ্যালয়গুলোও আছে। কড়াকড়ি শিথিল করলে শিক্ষার্থী ভাল গ্রেড না পেলেও হয়তো পাস করে যেত। অনেক ছাত্রছাত্রী পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে ছোটখাট চাকরি নিতে বাধ্য হয়।

বাস্তবে দেখা যায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের শতকরা ৪৭ ভাগ ঝরে পড়ে। সে তুলনায় শতকরা ৩৭ ভাগ ছেলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ধরে রাখার জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করার পরও তুলনামূলকভাবে বেশি ছাত্রী ঝরে পড়ার একটি কারণ হলো ছাত্রী থাকার সময় বিয়ে হয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয় না। মেয়েদের লেখাপড়া শিখে কি লাভ হয় সে ব্যাপারে আলোচনা হয় কমই। তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রেও তেমনি পরিবারের আর্থিক সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে এসএসসিসহ সব পরীক্ষায়ই প্রাইভেট টিউশন বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। নিম্নবিত্ত বা গ্রামীণ পরিবারের পক্ষে প্রাইভেট টিউশনের খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ইংরেজি ও অঙ্কের শিক্ষকের অভাবে এ দুটি বিষয়ে ভালভাবে পড়ানো হয় না। এসএসসি পরীক্ষায় আবার এ দুটি বিষয়েই ফেল করে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। এমনকি 'টেস্ট' পরীক্ষায়ও ইংরেজি ও অঙ্ক ভাল না করলে 'ফরম পূরণ' করতে দেয়া হয় না।

মাধ্যমিক শিক্ষার ড্রপ-আউট এক ধরনের সিস্টেমলস। শতকরা ৪২ ভাগ ড্রপ-আউট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। সরকারি-বেসরকারি সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরেজি ও অঙ্কের শিক্ষকদের সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায় এবং ইংরেজির শিক্ষকদের মান কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তা নিয়ে গবেষণা কম হয়নি। কিন্তু বাস্তবে ফল যে পাওয়া যাচ্ছে না তা দেখাই যাচ্ছে প্রতিবছর অস্বাভাবিক হারে ড্রপ-আউটের মাধ্যমে। প্রাইভেট কোচিংয়ের কালচার থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায় তা নিয়েও গবেষণা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাইভেট কোচিংয়ে ব্যস্ত থাকায় স্কুলে ঠিকমত পড়ান না। এসব বাস্তবতার নিরিখে দ্রুতই পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে তার দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করতে হবে। সমস্যাটি শুধু শিক্ষার সমস্যা নয়, এটি একটি জাতীয় সমস্যা। সুতরাং দায়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হলেও তাদের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষক সমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যদের নিয়েই কাজ করতে হবে। যত দ্রুত করতে পারা যাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ড্রপ-আউটের বিষচক্র থেকে তত দ্রুত মুক্ত করা যাবে।